বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের গতিধারা

[শহুরে খাত]

এম এম আকাশ*

১. আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতাসমূহ

১.১ সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে তাদের সামাজিক বিকাশের প্রবণতা অনুযায়ী কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেত : পুঁজিবাদী বিকাশের ধারায় রয়েছে এমন দেশ, সমাজতন্ত্র অভিমুখীন দেশ এবং 'মধ্যবর্তী' দেশ—যেখানে বিকাশের প্রবণতা সহজেই চিহ্নিত করা যায় না। আজ বলা যায় যে, তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশের সংখ্যা খুবই কমে গেছে। যেখানে তা টিকে আছে তার কারণ হচ্ছে অস্বাভাবিক মাত্রায় আর্থসামাজিক পশ্চাৎপদতা।

১.২ পুঁজিবাদ অভিমুখীন দেশগুলোর পুঁজিবাদী ধারার সঙ্গে পশ্চিমী ধ্রুপদী পুঁজিবাদের বিকাশের অনেক অমিল রয়েছে। তাই এসব দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে সাদামাটাভাবে 'পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি'—এভাবে নামকরণ সমীচীন হবে না। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাহিত্যে এদের সম্পর্কে বিভিন্ন নামকরণ চালু রয়েছে। যেমন, পরনির্ভরশীল ধরনের পুঁজিবাদ (Assymetrical/one sided), নিকৃষ্ট পুঁজিবাদ (Inferior Capitalism), প্রান্তিক পুঁজিবাদ (Peripherical Capitalism), আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ (Bureaucratic State Monopoly Capitalism), আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ (Bureaucratic Capitalism), রাষ্ট্রীয় পরিপোষক ধনতন্ত্র (State Sponsored Capitalism), মধ্যম পুঁজিবাদী দেশসমূহ (Medium Development Capitalist Countries), ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ (Colonial Capitalism) ইত্যাদি।

তবে এই ধরনের নামকরণের প্রধান বিপদ এই যে, এসব নামের পিছনে যে উপাদান রয়েছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ছাড়া এগুলি প্রায়ই

---

* অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একদেশদর্শী এবং বিমূর্ত প্রত্যয়ে পরিণত হয় এবং প্রায়ই অহেতুক তর্ক-বিতর্ক ও ভুল ব্যাখ্যার জন্ম দিতে পারে।

১.৩ সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদগণ প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে দ্রুত আধিপত্য বিস্তারকারী Leading Economic Structure বা নেতৃত্বদানকারী অর্থনৈতিক কাঠামোগুলিকে চিহ্নিত করে 'পুঁজিবাদ অভিমুখীন দেশগুলির' নিম্নোক্ত শ্রেণী বিভাগ করেছেন ঃ

ক. Feudal Absolutist State Monopoly Capitalism (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ব্রুনাই ইত্যাদি)।

খ. Bureaucratic State Capitalism (আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ—ইন্দোনেশিয়া, মিশর, বাংলাদেশ ইত্যাদি)।

গ. State Capitalism (রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ—ভারত, শ্রীলংকা, তিউনেশিয়া)।

ঘ. Private Capitalism in Co-operation with Foreign Monopoly (বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ব্যক্তি পুঁজি-বাদ—মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন)।

ঙ. State Monopoly Capitalism (রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ-দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক, থাইল্যান্ড ইত্যাদি)।

১.৪ এইসব উন্নয়নশীল দেশগুলোর development limit বা উন্নয়নের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের state monopoly capitalism এবং তা প্রধানতঃ দুইভাবে হতে পারে।

ক. প্রথমে আমলাতান্ত্রিক পুঁজি (Bureaucratic Capital) বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদই (State Capitalism) দ্বিধাবিভক্ত স্থানীয় বুর্জোয়াদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে, পরবর্তীকালে এই আমলাতান্ত্রিক পুঁজি (Bureaucratic Capital) এবং স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠীর আঁতাতের ভিত্তিতে 'রাষ্ট্রীয়' একচেটিয়া পুঁজিবাদের উদ্ভব হবে। এসব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি মূলতঃ রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সক্রিয় থাকে।

খ. আমলাতান্ত্রিক পুঁজি (Bureaucratic Capital) এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের (State capitalism) পাশাপাশি স্থানীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে বহুজাতিক কোম্পানির শক্তিশালী সহযোগিতা (Vigorous co-operation) শুরু থেকেই থাকবে। এ ধরনের প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক সহযোগিতার (Direct and large scale co-operation) ফলে স্থানীয় বৃহৎ মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের আধিপত্যের বা স্বার্থের অধীনে থেকেই রাষ্ট্র ও আমলা পুঁজি সক্রিয় হবে। এসব ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য-

বাদী পুঁজি মূলতঃ রাষ্ট্রের মাধ্যমে নয় বরং সরাসরি ব্যক্তিগত খাতের মাধ্যমে সক্রিয় থাকে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে কার কতটুকু প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা তার মাত্রার উপর নির্ভর করবে আমলা পুঁজি ও অ-আমলা পুঁজির আপেক্ষিক নেতৃত্বদানকারী ক্ষমতা।

১.৫ পুঁজিবাদ অভিমুখীন দেশগুলোতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'রাষ্ট্র' সম্পর্কে মার্কসবাদী সাহিত্যের চারটি ধ্রুপদী স্বীকৃত থিসিস নীচে দেওয়া হল ঃ

ক. উপরি-কাঠামোর তুলনায় ভিত্তি কাঠামোর অগ্রাধিকার।

খ. ভিত্তি কাঠামোর উপর উপরি-কাঠামোর সক্রিয় ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব।

গ. উত্তরণকাল পর্বে উপরি-কাঠামোর অপেক্ষাকৃত বর্ধিত স্বাধীনতা।

ঘ. উপরি-কাঠামোর এই স্বাধীনতার আপেক্ষিকতা অর্থাৎ চূড়ান্ত বিচারে উপরি-কাঠামোকে অবশ্যই বাস্তব ভিত্তি কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

চিরায়ত পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ধারার (Classical West European Model of Capitalism) ইতিহাসের দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী গঠন সামন্তবাদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে ভিত্তিমূলে পরিবর্তন আনে। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী সামন্তবাদী রাজনৈতিক ক্ষমতা যা অর্থনৈতিক ভিত্তির অভাবে ইতোমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছে তাকে বদলে রাজতন্ত্রের স্থলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা নীচ থেকে উপরে এবং বিস্তৃত প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক চরিত্রের বিকাশের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ এখানে পুঁজিবাদী বিকাশের তিনটি স্তর দেখা যাচ্ছে ঃ ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ (Private Competitive Capitalism), ব্যক্তিগত একচেটিয়া পুঁজিবাদ (Private Monopoly Capitalism), রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ (State Monopoly Capitalism)। এই ভাবে পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদী বিকাশ সম্পন্ন ও অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলির চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা ঃ

ক. এসব দেশে পুঁজিবাদী গঠনের সূচনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তলের দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়নি। এর উদ্ভব হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে। অনেকটা আরোপিত (Superimposed) বা 'উপর থেকে নীচে' এই কায়দায় (Top down manner)। কিছুটা পূর্ব ইউরোপের প্রুশীয় পুঁজিবাদী (Prussian Path of

Capitalism) ধারার সমতুল্য।

খ. এসব দেশে স্বাধীনতার পরেও স্থানীয় পুঁজিবাদী খাত এত দুর্বল থাকে যে, তার পক্ষে রাষ্ট্র ক্ষমতার সাহায্য ব্যতীত সামন্তবাদ বা তার অবশেষকে সম্পূর্ণ পরাজিত করা সম্ভব হয় না।

গ. শুধু আবহমানকালের (Traditional) পশ্চাৎপদ গঠনগুলিকে পরাজিত করা নয়, অন্য কারণেও বিকাশমান পুঁজিবাদী গঠনের (Capitalist Structure) রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রয়োজন। চিরায়ত পুঁজিবাদী ধারায় যদি এসব দেশ অগ্রসর হতো তাহলে প্রয়োজন হতো প্রায় শতাধিক বছর সময়। এসব দেরীতে যাত্রাকারী (late starter) উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলোর হাতে বর্তমানে সেই সময় নেই। এ ছাড়া বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে প্রযুক্তির আয়তন (scale) এবং পুঁজির ঘনত্ব (capital intensity) এত বেড়ে গেছে যে এসব দেশে আধুনিক শিল্পোদ্যোগ চালু করতে গেলে প্রায় ক্ষেত্রেই বিশাল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন হয়। অতএব, এখানে বাস্তব পরিস্থিতির তাগিদেই দ্রুত লম্ফ দিয়ে পুঁজিবাদী ধারা বিকাশ লাভ করে। Private competitive capitalism বা প্রতিযোগিতামূলক অবাধ পুঁজিবাদী বিকাশের পর্যায়কে (phase) সরাসরি লম্ফ দিয়ে অতিক্রম (skip over) করে একচেটিয়ে পুঁজি বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পর্যায়ে (Monopoly or State Monopoly) চলে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এই ত্বরান্বিত কৃত্রিম বিকাশের প্রয়োজনের কারণে রাষ্ট্রের সহযোগিতা বিশেষভাবে আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ঘ. এই ধরনের 'ত্বরান্বিত কৃত্রিম বিকাশের' ফলে যে সামাজিক বিশৃংখলা (Tension) ও শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রায়ন ঘটে তা দমনের জন্যও শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই প্রায়ই এ ধরনের দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি টিকছে না। নানা ধরনের স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব হচ্ছে।

ঙ. বাজার, প্রযুক্তি, পুঁজি সবদিক দিয়েই উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এসব উপাদান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে 'সাহায্য' বা concession হিসাবে আদায়ের ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্র' প্রধান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। তাই এসব দেশের বুর্জোয়ারা তাদের স্বীয় অর্থনৈতিক স্বার্থেই রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল থাকে।

সুতরাং এটা দেখা যাচ্ছে যে, 'রাষ্ট্রের' বর্ধিত ভূমিকা বা আপেক্ষিক স্বাধীনতার মাত্রা এসব দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং এরকমটি হবার অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা রয়েছে। রাষ্ট্র সংক্রান্ত মার্কসীয়

ধ্রুপদী ব্যাখ্যার সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের আপাতঃ স্বাধীন ভূমিকার কোন মৌলিক অসঙ্গতি নেই।

১.৬ রাষ্ট্রের এ ধরনের বিশেষ ভূমিকা সমৃদ্ধ পুঁজিবাদের মাধ্যমে প্রাচ্যের এসব দেশের বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের মৌলিক সমস্যার কোন পূর্ণ ও স্থায়ী সমাধান হয় না। যেমন ঃ

ক. একদিকে পুঁজিঘন প্রযুক্তির ব্যবহার অন্যদিকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে বেকার সমস্যা ক্রমাগতই বেড়ে যেতে থাকে।

খ. 'Excellence' টাইপের অথবা 'Skyscraper Model of Capitalism' গড়ে ওঠায় এমনকি মাঝারি ও ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদেরও (যারা রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য পাচ্ছে না) সর্বনাশ ঘটে যায়। অতএব, ব্যাপক জাতীয় অসন্তোষ গড়ে ওঠে।

গ. রাষ্ট্র কর্তৃক পরিপোষণের (spoon-feeding) ফলে পুঁজিপতিদের চরিত্র হয়ে ওঠে অনুৎপাদনশীল ও পরজীবী (Unproductive & Parasitic)। প্রায় ক্ষেত্রে এদের অভিজ্ঞতা, ট্রাডিশন এবং রুচি শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের (Industrial Capitalism) পক্ষে থাকে না। শিল্পের ক্ষেত্রে ঝুঁকি, আপেক্ষিক মুনাফার হার (Relative Return)-এর কমতির সমস্যা এবং সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা ও প্রায়ই এক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

ঘ. সামন্ত-অবশেষসমূহ অনেক সময়ই পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করা যায় না। রাষ্ট্র মৌলিক ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয় না এই আশংকায় যে পাছে তার বিদ্যমান গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ বেড়ে যায়।

ঙ. আমলা পুঁজি (Bureaucratic Capital), বৃহৎ ব্যক্তি পুঁজি (Private Big Capital), মধ্যম ও ক্ষুদ্র পুঁজি (Middle & Small Capital) এবং ট্রাডিশনাল্ রক্ষণশীল এলিটদের অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থায়ী অস্থিতিশীলতার মধ্যে নিক্ষেপ করে।

চ. এসব দেশে প্রায় ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নব্য স্বৈরতন্ত্র (New Bonapartist)-এর উদ্ভব হয়। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য পরিশিষ্টের প্রামান্য তথ্যপঞ্জী দেখুন)। প্রবৃদ্ধিহীনতা, লুন্ঠন ও শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি এ ধরনের সমাজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যে (Intrinsic feature) পরিণত হয়।

১.৭ পুঁজিবাদ অভিমুখীন প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে উপর বর্ণিত সাধারণ সংকটগুলি থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত একগুচ্ছ প্রাগ্রসর নমুনা দেশও (Model Country) বর্তমানে তৈরী হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ

বর্তমানে এইসব মডেল সামনে তুলে ধরে প্রচার চালাচ্ছে। এসব মডেলের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া মডেল। এই মডেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সস্তা শ্রমভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচার রপ্তানী। এই মডেলের অধীনে সীমিত পুঁজিবাদী আধুনিকরণ (modernisation) সম্ভব হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়া আরেকটি ব্যতিক্রমী গোষ্ঠী হচ্ছে তেল সমৃদ্ধ আরব দেশসমূহ (Oil-rich Arab Countries)। এছাড়া তৃতীয় বিশ্বে আরেকটি অন্যতম বিশিষ্ট দেশ হচ্ছে ভারত। কিন্তু এসব ব্যতিক্রম বা নমুনা দেশ (model)—এর গুণাগুণ যা-ই থাকুক না কেন এগুলো মোটেও অন্যত্র প্রয়োগযোগ্য (reapplicable) নয়। কিন্তু তবু এটাই বর্তমানে মুখ্য সাম্রাজ্যবাদী প্রেসক্রিপশন হিসাবে সামনে চলে আসছে। পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে যে, এমনকি এসব তথাকথিত মডেল দেশও বর্তমানে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইত্যাদি নানা ধরনের সংকটের কবলে পড়েছে। সুতরাং মডেলভুক্ত অথবা মডেল বহির্ভূত উভয় প্রকার দেশেই পুঁজিবাদের এই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রনেতারা নিজেদের কর্মকৌশল প্রসঙ্গে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।

১.৮ বিশিষ্ট সোভিয়েত তাত্ত্বিক ক্যারেন ব্রুটেন্স-এর মতে '৮০ দশকের শুরুতে এসে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্ভবতঃ তার কৌশল কিছুটা বদলেছে। যেমন ঃ

ক. পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের পুঁজিবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 'কিছুটা শিল্পায়ন', কিছুটা 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' না ঘটলে তা মৌলিক সামাজিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। অতএব, সাম্রাজ্যবাদ এখানে আগের মত রক্ষণশীল শিল্পায়ন বিরোধী, জাতীয় পুঁজির বিকাশ বিরোধী ভূমিকা নেয়াটা সমীচীন মনে করছে না।

খ. তারা নয়া উপনিবেশগুলিতেও 'শিল্পায়ন' অনুমোদন করছে। কিন্তু তা হতে হবে বিশেষ ধরনের শর্তাধীন। যেমন, মূল pilot plant কেন্দ্রে (metropolis) রেখে সাবকন্ট্রাক্ট (subcontract)-এর ব্যবস্থা করা বা আংশিক প্রক্রিয়াজাতকরণ (partial processing) এর জন্য প্রান্তে (periphery) শিল্পের শাখা গড়ে তোলা। খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন, প্রাথমিকভাবে কাঁচামালের অর্ধ-প্রোসেসিং, শ্রমঘন ও বেশী বিদ্যুৎ ও শক্তি প্রয়োজন এমন শিল্প পুরোটা বা তার অপারেশনের অংশ বিশেষ (partial operationing), পরিবেশ দূষিত হতে পারে (Environmental pollution) এমন সব রাসায়নিক ঔষধ শিল্প (Chemical Pharmaceutical Industry) ইত্যাদি সবই সাম্রাজ্যবাদ এখন নয়া উপনিবেশে স্থানান্তর

(relocate) করতে প্রস্তুত। তবে এসব ক্ষেত্রে তারা মূলতঃ মিশ্র উদ্যোগ (Mixed Venture) এবং বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে স্থানীয় বুর্জোয়ার সংযুক্ত উদ্যোগের পক্ষপাতি।

গ. নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (N. I. E. O.) সরাসরি বিরোধিতা তারা এখন করছে না। বরং সমস্যাটিকে তারা এখন উত্তর-দক্ষিণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করছে। এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের উপরেও তৃতীয় দুনিয়ার পশ্চাদপদতার দায়ভার চাপিয়ে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ অতি সম্প্রতি স্থানীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের (confrontation) বদলে অংশীদারিত্ব (partnership), পারস্পরিক নির্ভরতা (Interdependence) ও স্থানীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগ (local private initiative)-এর উপর জোর দিয়ে নানা সংস্কারের বক্তব্য সামনে তুলে ধরছে।

ঘ. সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতাকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি স্থানীয় বুর্জোয়া অথবা/ও N.G.O (Non-Government Organisation) এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে। সরকারী সাহায্যের (Official aid) পরিবর্তে বেসরকারী পুঁজি প্রবাহকে বর্তমানে অধিকতর মাত্রায় উৎসাহিত করা হচ্ছে।

২. বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের ইতিহাস ঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

২.১ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে এদেশে হিন্দু ও মারোয়াড়ীরাই মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের মূল অবস্থানগুলি দখল করে রেখেছিল। চট্টগ্রামে মাত্র কয়েকজন বাঙালী মুসলমান সওদাগর ছিলেন।

২.২ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর হিন্দু ও মারোয়াড়ী পুঁজির ধীরে ধীরে বহির্গমন সূচিত হয়। কিন্তু সেই শূন্যস্থান বাঙালী মুসলমানেরা পূরণ করেনি, করেছে বহিরাগত অবাঙালী গোষ্ঠী।

২.৩ তবে লিবারেল প্রোফেশন (liberal profession), জমি, স্থাবর সম্পত্তি (Real Estate) ইত্যাদি ক্ষেত্রে শূন্যস্থান পূরণের জন্য বাঙালী মুসলমানদের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। পাটের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে বাঙালী চাষী বা অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তর থেকেও কিছু লোক উচ্চ শিক্ষাকে পুঁজি করে উপরে উঠে আসে। ১৯৬০ সাল নাগাদ তৈরী হয় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত স্তর।

২.৪ ১৯৫৮তে সামরিক আইন জারীর পর আইয়ুব খান এদেশে একটি মুৎসুদ্দী বাঙালী গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। গ্রামে

বুনিয়াদী গণতন্ত্র এবং শহরে E.P.I.D.C'র মারফত State Sponsored Capitalism-এর ধারা চালু হয়।

২.৫ ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর মারোয়াড়ী ও হিন্দু পুঁজি এদেশ থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে যায়। তখন শত্রু সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট শূন্যতা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাকে আশ্রয় করে এদেশে দ্রুত একটি বাঙালী ধনিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তবে তারা ছিল পাকিস্তানী পুঁজিপতিদেরই কনিষ্ঠ অংশীদার। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তারা সমর্থন করেছিলেন সেটাকে lever হিসাবে ব্যবহার করে রাষ্ট্র থেকে কিছুটা বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য। তাই স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে এই মুৎসুদ্দী ধরনের পুঁজিপতিরা অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় বা বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিলেন। [তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য]

২.৬ এসব প্রাক্-স্বাধীন বাঙালী বুর্জোয়াদের হাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা লব্ধ যে সব শিল্পোদ্যোগ ছিল তার মধ্যে ৭০-৮০টি পাটকল, বস্ত্রকল ও চিনিকলই হচ্ছে প্রধান। স্বাধীনতার পর এগুলি সবই জাতীয়করণ করা হয়। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে তারা শুধু অবাধ বিকাশের অধিকারই হারায় নি, একটি তীব্র অপ্রত্যাশিত আঘাতেরও সম্মুখীন হয়েছিলেন।

২.৭ মূলতঃ লুটপাট ও দুর্নীতি, যেমন, বিদেশী সাহায্য বন্টনে দুর্নীতি, লাইসেন্স-পারমিট ক্রয়-বিক্রয়ে দুর্নীতি, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের-লেনদেনে (Transaction) দুর্নীতি, মজুতদারী, কালোবাজারী ইত্যাদি পন্থায় এবং অভ্যন্তরীণ বৈধ ব্যবসায় ঘাটতি প্রিমিয়াম অর্জন, কন্ট্রাক্টরী ও বিভিন্ন ধরনের সাপ্লাই ব্যবসার মাধ্যমে ১৯৭২-'৭৫ কালপর্বে এদেশে একটি নব্য ধনিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তাদের হাতে অবৈধ পন্থায় অর্জিত প্রচুর কালো টাকা জমা হয়। রাষ্ট্রক্ষমতার ভিতরে রাজনৈতিক আনুকূল্য এবং প্রশ্রয়ের ছত্রচ্ছায়াতেই এই গোষ্ঠীর জন্ম ও বিকাশ। কিন্তু তদানীন্তন অনুসৃত রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতিমালার কাঠামোর মধ্যে তারা তাদের অর্জিত অর্থের সামাজিক বৈধতা ও নিরাপত্তা সংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এছাড়া পেটিবুর্জোয়া উগ্রবাম শক্তি, রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি, ট্র্যাডিশনাল বাঙালী বুর্জোয়া এবং সর্বোপরি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন, প্রকাশ্যে বা গোপনে, কামনা করছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয় ও তার পরিণতিতে এই শক্তিগুলিই কমবেশী আজ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ও পুনর্বাসিত হয়েছে।

বস্তুতঃ জিয়া, সাত্তার ও এরশাদের আমলে রাজনৈতিক ও অর্থ-

নৈতিক সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকার ইতিহাস প্রণয়ন করলে একথা খুবই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে।

'৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পর জেনারেল জিয়ার আমলে অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে এবং জেনারেল এরশাদের আমলে প্রবল বেগে উল্লিখিত সমগ্র বুর্জোয়া গোষ্ঠীই তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে সংহত করেছে। এদেরকে আপাততঃ আমরা পাঁচটি ভাগে (section) বিভক্ত করতে পারি ঃ

ক. আমলা বুর্জোয়া
খ. ট্র্যাডিশনাল বৃহৎ বাঙালী বুর্জোয়া
গ. বৃহৎ নব্য ধনী
ঘ. মাঝারী নব্য ধনী
ঙ. ছোট মালিক

'ঙ' ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বাকী সকলের বিকাশের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের অবদান এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকাই হচ্ছে নিয়ামক ভূমিকা। রাষ্ট্রের অর্থ ও লুন্ঠনের আপেক্ষিক অবদান আমলা বুর্জোয়া, ট্র্যাডিশনাল বাঙালী বুর্জোয়া ও বৃহৎ নব্যধনীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এবং তাদেরকে 'লুটেরা বুর্জোয়া' নামে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না। [তবে সিমোনিয়ার ভাষ্য অনুসারে এরা সকলেই হচ্ছে সম্মিলিতভাবে কম-বেশী 'আমলা পুঁজির' রকমফের। কারণ, এসব ব্যক্তিপুঁজির জন্ম হয়েছে স্বাভাবিক পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে নয়, বরং রাষ্ট্রের অবৈধ সহযোগিতা বা উচ্চপদের আমলাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে। আবার লুন্ঠনের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে এদের মধ্যে একটা অবৈরীতামূলক দ্বন্দ্বও বিদ্যমান।]

৩. বাংলাদেশের বুর্জোয়া গোষ্ঠী ঃ সাম্প্রতিক তথ্যাবলী

৩.১ রাষ্ট্রকর্তৃক প্রচুর সহজ শর্তের ঋণ, সস্তা বিনিয়োগ, কর মওকুফ, অনুকূল বাণিজ্যনীতি, কঠোর হস্তে শ্রমিক দমন ইত্যাদি পৃষ্ঠপোষকতার পরেও প্রকৃত ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ক্রমহ্রাসমান (১৯৮০-৮৫ সালে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ দ্রষ্টব্য)। শিল্পখাতের উৎপাদন স্থবির বা বড়জোর সমহারে বাড়ছে অর্থাৎ মোট উৎপাদনে তার অবদান ৯% বা তার কাছাকাছি ওঠানামা করছে।

৩.২ বুর্জোয়াগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় অতঃপর রাষ্ট্রীয় অর্থের অবাধ লুন্ঠনের ও অবাধ বাজার ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোর জন্য একে

একে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়েছে ও হচ্ছে ঃ

ক. লাভজনক কারখানা থেকে পুঁজি প্রত্যাহার (Disinvestment)।

খ. বিরাষ্ট্রীয়করণ (৩২টি পাটকল এবং ২৮টি বস্ত্রকল)।

গ. ব্যক্তিমালিকানায় কমদামে ব্যাংক হস্তান্তর।

ঘ. কৃষি উপকরণের ব্যবসার ব্যক্তিগতকরণ (Privatisation)।

ঙ. রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও বিদেশী সাহায্য থেকে ঋণ প্রধান ও বকেয়া ঋণ মওকুফ বা ঋণশোধে গড়িমসিকে প্রশ্রয় দান।

চ. হোল্ডিং কোম্পানী ব্যবস্থার প্রবর্তন।

ছ. বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বিদেশী ফার্মের হাতে হস্তান্তর।

জ. ব্যক্তিগতখাতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য নানা রকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।

উপরোক্ত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ অংশতঃ জিয়া সরকারের আমলে এবং সম্পূর্ণভাবে পুরোদমে এরশাদের আমলে চালু হয়েছে।

৩.৩ ১৯৮০-৮৫ কালপর্বে ব্যক্তিগত খাতে বাংলাদেশের মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৬৮৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে তের শতাংশ হচ্ছে ব্যক্তি-মালিকদের নিজেদের অবদান। বাকী ৭০ শতাংশের মধ্যে ৪৫ শতাংশ যুগিয়েছে বৈদেশিক সাহায্য এবং ২৫ শতাংশ যুগিয়েছে স্থানীয় ঋণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মূল অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য ও রাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকারী ভূমিকাই প্রধান।

তবে সমগ্র ব্যক্তিগত বিনিয়োগের বদলে যদি শুধু শহরের ম্যানুফ্যাকচারিং ও ব্যবসায় ব্যক্তিগত বিনিয়োগের হিসাব নেওয়া হয় (১৬./`÷ ১৬./`=৩২% মোট ব্যক্তিগত বিনিয়োগের) তাহলে এসব অনুপাত আরও অনেক বেশী আশঙ্কাজনক হয়ে পড়বে।

৩.৪ মূলতঃ মুনাফার উচ্চতর হারের আকর্ষণের দরুণ সরকার ও সাম্রাজ্যবাদের প্রণোদনা সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা শ্রমঘন শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করছেন না। ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত বৃহৎ এবং মধ্যম মানের শিল্পখাতে বিনিয়োগের সুযোগ (provision) ছিল ২১৪৭ কোটি টাকা। কিন্তু দেখা যায় যে, এ সময়ে এ ধরনের পুঁজিঘন খাতে বাস্তবে অর্থ বরাদ্দ (sanction) হয়েছিল ২৮৬২ কোটি টাকা। অর্থাৎ সুযোগের (provision) চেয়ে বরাদ্দ (sanction) ছিল ৩৩./` বেশী। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটির শিল্পে (Small Scale and Cottage Industries) ঐ একই সময় বিনিয়োগ সুযোগ (provision) ছিল ৬৭৩ কোটি টাকা। কিন্তু ঐ সময়ে বরাদ্দ মাত্রা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৩৭৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ সুযোগের (provision) মাত্র ৫৫ শতাংশ। অতএব, শেষোক্ত ক্ষেত্রে পুঁজি-

পতিদের অনীহার লক্ষণ সুস্পষ্ট। [বস্তুতঃ এখানে সামাজিক কল্যাণ ও ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন এই দুই মাপকাঠির মধ্যে যে অনিবার্য বাস্তব বৈপরীত্য ও বিরোধ রয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে সবচেয়ে অনায়াসে এবং দ্রুত ধনোপার্জনের খাতগুলো হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানী, ইন্ডেন্টিং-সাপ্লাই ইত্যাদি। আর যদি লাভজনক সুদক্ষ শিল্প গড়তেই হয় তাহলে বর্তমান বিকৃত বাজার কাঠামোতে পুঁজিঘন-বৃহদায়তন সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর উদ্যোগ-গুলির প্রতিই বাড়তি ঝোঁক সৃষ্টি হবে। অথচ আমরা জানি যে, আমাদের দেশে শিল্পায়নের অন্যতম সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে বেকারত্ব নিরসন। একটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে একজন লোকের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন হয় ১১,৮৯৪'০০ টাকার স্থির পুঁজি বিনিয়োগ। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এর মাত্রা আরও কম, গড়ে মাত্র ২০০০'০০ টাকা (১৯৭৮ সালে পরিকল্পনা কমিশন প্রদত্ত হিসাবে)। অথচ আমাদের দেশে অত্যধিক পুঁজিঘন প্রকল্পের প্রকোপের কারণে গড় জাতীয় প্রান্তিক পুঁজি-শ্রম অনুপাতটি (National average incremental capital-labour ratio) হচ্ছে ৩২০০০ টাকা/শ্রমিক। সুতরাং পুঁজিবাদী বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত-প্রবণতাই আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা, বেকারত্বকে আরও তীব্রতর করছে। করে তুলছে দেশকে আর পরনির্ভরশীল। কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা যে কোন পুঁজিবাদী বিকাশ ধারার অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ। কিন্তু বাংলাদেশের, বিশেষতঃ এই জায়গাতে যে সে বিশ্বব্যাপী এক অনন্য সাধারণ প্রযুক্তি বিপ্লবের পটভূমিতে বহু দেরী করে পুঁজিবাদী ধারায় প্রবেশ করতে চলছে। এত দেরীতে যাত্রা শুরু করার দরুণ তার আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সমস্যাটি ইতিমধ্যেই এত উচ্চতর মাত্রা অর্জন করেছে যে, তা নিছক মুনাফা ভিত্তিক পুঁজিবাদী ধারায় আজ আর সমাধান করা যাচ্ছে না।]

৩.৫ বাংলাদেশের বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত বৃহৎ পাটকল ও বস্ত্রকল-গুলির বুর্জোয়া মালিকরা অতি সম্প্রতি তীব্র সংকটে পড়েছেন। প্রথমোক্তরা স্বীয় সংকটের বোঝা চাষীরা ঘাড়েই চাপিয়ে দিচ্ছেন এবং রাষ্ট্র তাদের প্রত্যক্ষভাবে এক্ষেত্রে সাহায্য করছে। তাছাড়া, পাটকলের তথাকথিত বাঙালী মালিকরা রাষ্ট্রের কাজ থেকে ভর্তুকিও দাবী করছেন। এদিকে বস্ত্রকলের মালিকরা কালোবাজারী, চোরাকারবারীর দৌরাত্মে পরাজিত হয়ে সরাসরি কারখানা 'লে-অফ'-এর দিকে ঝুঁকছেন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঁচামালসমূহের

শুল্ক কমানোর দাবী উঠেছে। মাঝারী শিল্প Re-rolling mill এর ক্ষেত্রেও বাজার সংরক্ষণ (protecting)-এর দাবী উঠেছে। শ্রমঘন মাঝারি শিল্প পোশাক শিল্পের মালিকরাও কিছুদিন আগে কোটা-বিপদের বিরুদ্ধে দেন-দরবার, বাজার বহুমুখীকরণ (Market diversification) ইত্যাদি কায়দায় ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হয়েছে। অর্থাৎ এ দেশের উৎপাদন খাতের নীচের মাঝারীক্ষুদ্র বুর্জোয়াগোষ্ঠী রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটি কাম্য (optimum) স্বার্থ সংশ্লেষণ প্রতিষ্ঠা সহজ হচ্ছে না। যেকোন প্রকৃত উৎপাদনশীল উদ্যোগই নানা কারণে কমবেশী মার খাচ্ছে। তবে বিপদের মাত্রা ছোট ও মাঝারী শিল্প-পতিদের ক্ষেত্রেই বেশী।

৩.৬ আমরা সম্প্রতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধনীদের বাদ রেখে বৃহৎ বাঙালী ধনী পরিবারের সংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। আমাদের অর্ধ সমাপ্ত জরীপের ফলাফল থেকে নিম্নোক্ত প্রাথমিক ও খসড়া তথ্য-গুলি পাওয়া যায় ঃ

ক. ২৫ কোটি টাকার বেশী সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এরকম ধনী পরিবারের সংখ্যা বাংলাদেশে নিতান্ত কম নয়। ইতোমধ্যেই তা ন্যূন-তমভাবে হলেও শতাধিকে পরিণত হয়েছে।

খ. খসড়া হিসাবে এ ধরণের ১০০ হাউজের মধ্যে শতকরা বিশ জন একই সঙ্গে ১. Private Bank ২. Denationalised/Disinvested Industry, ৩. Overdue loans from B, S, B, B, S, R, S, ৪. Overdue loans from Nationalised Commercial Bank ৫. Stock Exchange Company'র সঙ্গে জড়িত। বস্তুতঃ এরা খুবই শক্তিশালী এবং সকল ক্ষেত্রেই এদের শুঁড় বিস্তৃত হয়েছে। আরও শতকরা ৩০ জন রয়েছেন যারা Disinvested Industry, Loans of B, S, B, B, S, R, S এবং Stock Exchange Company'র সদস্য—এই তিনটি ক্ষেত্রের সাথেই জড়িত আছে। শতকরা ৫০ জন আছেন যারা BSB, BSRS-এর ঋণ নিয়ে মধ্য ও ছোটখাট সার্ভিস প্রকল্প গড়ে তুলেছেন। তবে আমাদের ধারণা যে, এদের প্রত্যেকেরই আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা, স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, বিদেশী ব্যাংকে জমা টাকা ইত্যাদি গোপন উদ্যোগ রয়েছে।

৩.৭ যদি উল্লিখিত শতাধিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত 'পরগাছা ও লুটেরা চরিত্রের বুর্জোয়াদের' একটি পূর্ণাঙ্গ নাম-তালিকা প্রণয়ন করে ব্যক্তি পর্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালানো হয় (যে কাজটি কিছুটা শুরু হয়েছে মাত্র) তাহলে দেখা যাবে যে, এদের সঙ্গে জাতীয় পার্টি,

বি. এন. পি এবং আওয়ামী লীগ এই তিনটি রাজনৈতিক দলেরই যোগাযোগ রয়েছে। যদিও ক্ষমতাসীন পার্টি হিসাবে এ ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাত্রা হবে সর্বাধিক।

৩.৮ আমাদের দেশের সরকারসমূহ বৈদেশিক পুঁজিকে নানা সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। '৭৫ পরবর্তীকালে এতে ধীরে ধীরে এবং নগণ্য মাত্রায় হলেও কিছু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাবলী তথ্যপঞ্জীতে দেয়া হলো। ঐ তথ্যগুলি থেকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে ঃ

ক. আমাদের দেশে পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানীগুলি পুঁজি বিনিয়োগের জন্য তেমন একটা এগিয়ে না আসলেও দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব, ভারত ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত প্রাগসর উন্নয়নশীল দেশ পুঁজি বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসছে।

খ. এসব পুঁজি বিনিয়োগকারীরা প্রধানতঃ মিশ্র উদ্যোগে বিশ্বাসী এবং রপ্তানীমুখী শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচার বা আংশিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের দিকেই এদের ঝোঁকটা বেশী।

৩.৯ সম্প্রতি বাংলাদেশের জন্য সাম্রাজ্যবাদী পলিসি প্রণেতারা (বাইরের এবং ভিতরের) চাচ্ছেন যাতে কিছুটা সংস্কার (reform), কিছুটা শৃংখলা, কিছুটা প্রবৃদ্ধি, কিছুটা আধুনিকতার সঞ্চার ঘটিয়ে সম্ভাব্য গণবিস্ফোরণকে ঠেকানো যায় বা তাকে অন্ততঃ আরো পিছিয়ে দেওয়া যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা সম্ভবতঃ কোন না কোন ধরনের গণতান্ত্রিক ছদ্মাবরণ গড়ে তুলতে চাইছেন। এই জন্য প্রায়ই আমরা তাদের মুখে নানা ধরনের কথাবার্তা শুনছি। যেমন—

ক. বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেভিড হপার ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সফর শেষ করে প্রত্যাবর্তনকালে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে বকেয়া ঋণের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে আশা করেছেন যে, বাংলাদেশ সরকার সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেবেন। ['৮৬ মার্চ মাসের দৈনিক সংবাদ দ্রষ্টব্য]

খ. BSB এবং BSRS এই শিল্পঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণ প্রদানকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ADB তার সুপারিশে প্রস্তাব করেছিল যে, এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়কারী পরিষদে যাতে তাদের প্রতিনিধিও নেয়া হয়। এমনকি এক পর্যায়ে তারাই উদ্যোগ নিয়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রদান স্থগিত রাখে বা loan freeze করে দেয়। অবশেষে ২১ অক্টোবর '৮৬, 'বাংলার বাণী'র রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ADB সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছে যে, BSB ও BSRS-

এর পরিবর্তে সরাসরি তাদের মাধ্যমে ঋণদানের পদ্ধতি চালু করা হোক। অর্থাৎ ADB চাচ্ছে আমলাতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ঋণদান ব্যবস্থা চালু করতে। [বস্তুতঃ এর ফলে ঋণের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না অথচ পরোক্ষভাবে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব পড়বে সরকারের উপর।]

গ. পরিকল্পনা কমিশনকে এবং বাংলাদেশ সরকারকে পুঁজিবাদী ধারায় শিল্পায়নের ব্যাপারে নানাবিধ পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বর্তমানে TIP (Trade and Industrial Policy) প্রজেক্টের অধীনে কর্মরত আছেন। তাদের একটি প্রাথমিক রিপোর্টের (Private Investment in Bangladesh : An optimistic appraisal) উপসংহারে তারা ১৯৮৪ সালে বলেছেনঃ "There has been a growing boom in private investment over the last year and a half [এটা সরকারী তথ্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় না।] which has attracted little attention. While people have noted the decline in BSB and BSRS financed investment and the poor performance of past loans, import of capital goods financed without long term loans quietly have overtaken the former category in total volume. Hundreds of small investments averaging only a fifth the size of imports under cash license have added up to a major source of aggregate investment. We have argued that those small investors lend strong support to the position that there is potential for rapid growth of industrial investment if private entrepreneurs are free to seek their own projects. The free sectors and streamlined sanctioning have been a boon to both investors and the country. Reduction of interference in investors' activities is getting results and should be continued".

উল্লেখিত হুমকি ও সুপারিশের প্রভাব বর্তমান সরকারের উপরেও পড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে চাপের মুখে রাষ্ট্রপতি এইচ. এম. এরশাদ ধোলাইখালের রাস্তায় অবস্থিত ক্ষুদ্র শিল্প মালিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রচলিত অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরে থেকে এ ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না।

৪. ট্র্যাডিশনাল বাঙালী বুর্জোয়া ও নব্যধনী (বৃহৎ) : তুলনামূলক পর্যালোচনা

৪.১ পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা পাকিস্তান আমলেই অল্প সংখ্যক বাঙালী বুর্জোয়ার উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে প্রামাণ্য আরো বিস্তৃত তথ্যাবলী নীচের তালিকাগুলিতে মন্তব্যসহ উপস্থিত করা হলো।

তালিকা—১

পূর্ব পাকিস্তানে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমদানী বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ

গ্রুপ		
১. বাঙালী মুসলমান—	—	—৭%
২. বাঙালী হিন্দু—	—	—৭%
৩. মেমন সম্প্রদায়—	—	—৩৭%
৪. অন্যান্য অবাঙালী সম্প্রদায়—		—২৯%

উৎস:— [রেহমান সোবহান, ১৯৮২, পৃঃ—৭২]

রেহমান সোবহান উক্ত তালিকাটি উদ্ধৃত করার পর দুটো মন্তব্য করেছেন, "ঋণনীতির সময়সূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রথম-দিকে ঋণের সিংহভাগ ভোগ করেছেন প্রধানতঃ অবাঙালী শিল্পপতিরা। ষাটের দশকের প্রথমদিকে বাঙালী মালিকদের দ্বারা কিছু কিছু বস্ত্র-কারখানা প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। এগুলি হয় তারা নিজেরাই করে-ছিলেন অথবা অবাঙালীদের সঙ্গে যৌথভাবে করেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই তখন আই. ডি. বি. পি. সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ ষাটের দশকের শেষভাগে বাঙালীদের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন দরোজা পুরো-পুরি খুলে দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালে নাগাদ বাঙালী মালিকদের দ্বারা পাট ও বস্ত্রশিল্প গড়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ আসতে থাকে। তাই হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, এই ১৯৬৯-৭১ সাল ব্যাপী সময়-টাতেই এইসব ঋণদান সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের সিংহভাগ তথা ৪৬ শতাংশ ব্যয়িত হয়েছে।

... ..."সরকারের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় নির্মিত ১০টি মিলের এক নমুনা জরিপে দেখা যায় যে, এসব মিল স্থাপনের ইকুয়িটি খরচের ৮০ শতাংশই বহন করেছিল ই. পি. আই. ডি. সি।...অনেক ক্ষেত্রে ই.

পি. আই. ডি. সিকেই প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হয়েছিল। ই. পি. আই. ডি. সি-র ইকুয়িটি খরচ বহনের পরেও প্রকল্পের প্রায় ৭০ শতাংশ খরচ বহন করেছিল বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা।"

তালিকা—২

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ বিন্যাস

১৯৫৯-৭১ (মিঃ টাকা)

গ্রহীতা	পি. আই. সি. আই. সি.	./'	আই. ডি. বি. পি.	./'	মোট	./'
১. অবাঙালীদের দেওয়া ঋণ	৪২৯	৩৭	৩০৭	২৯	৭৩৬	৩৩
২. বাঙালী পাটকল ও বস্ত্রকল মালিকদের দেওয়া ঋণ	৪৭২	৪১	৪৭৯	৪৫	৯৫১	৪৩
৩. অন্যান্য বাঙালীদের দেওয়া ঋণ	২৪৭	২২	২৭৪	২৬	৪২১	২৪
৪. মোট (১৯৫৯-৭১)	১১৪৮		১০৬০		২২০৮	
৫. ঋণ (১৯৬৯-৭১)	৬০৪		৪১৭		১০২১	
৬. ৫নং ৪নং এর শতাংশ হিসাবে		৫২		৩৯		৪৬

[উৎস : প্রাগুক্ত, পৃঃ—৮১]

অবশ্য ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ বৃহৎ ট্র্যাডিশনাল বাঙালী বুর্জোয়াদের উদ্ভব যে হয়েছিল তার প্রমাণ মিলবে নীচের তালিকাটিতে।

তালিকা—৩

১৯৬৯-৭০ সালে প্রধান বাঙালী ব্যবসায়ী পরিবার

ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নাম	কোম্পানীর সংখ্যা	আনুমানিক সম্পদ (মিঃ টাকা)
১. এ. কে. খান	১২	৭৫
২. গুলবখ্ত ভুঁইয়া	৫	৬৫
৩. জহুরুল ইসলাম	১৪	৬০
৪. ফকির চাঁদ	১০	৬০
৫. মকবুলার রহমান ও জহিরুল কাইয়ুম	৯	৫০
৬. আলহাজ্জ মুসলিমউদ্দীন	৬	৫০
৭. আলহাজ্জ শামসুদ্দোহা	৫	৫০
৮. খান বাহাদুর মুজিবর রহমান	৪	৪৫
৯. আফিল	৭	৪০
১০. সাত্তার	৫	৪০
১১. আশরাফ	৪	৩০
১২. ভান্ডারী	৬	৩০
১৩. সফদর আলী	৭	৩০
১৫. ইব্রাহিম মিয়া	৭	৩০
১৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	৪	২৫
১৬. মোঃ আবদুস সামাদ	৫	২৫
		মোট—৬৯৫

৪.২ রেহমান সোবহান, বারানভ ও ডঃ ফারুক প্রদত্ত তথ্যাবলী থেকে বোঝা যায় যে, প্রাক্-স্বাধীনতাকালীন ট্র্যাডিশনাল বাঙালী বুর্জোয়াদের অধিকাংশের পিতাই ছিলেন ক্ষুদে ব্যবসায়ী অথবা কৃষক। অর্থাৎ এরা কেউই উত্তরাধিকার সূত্রে বড়লোক ছিলেন না। এরা ছিলেন প্রথম-পুরুষ উদ্যোক্তা। এসব উদ্যোক্তাদের নিজেদের কর্মজীবনও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে ক্ষুদে ব্যবসায়ী বা ক্ষুদে কর্মচারী হিসাবে। অর্থাৎ এরা সম্পদ সঞ্চয় করেছেন ধীরে ধীরে, দ্রুত ধনিক এরা নন। তবে শিল্প বা কল-কারখানা বা কোন উৎপাদনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে তারা পুঁজি সঞ্চয় করেন নি। মূলতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঠিকাদারী বা সরবরাহ ব্যবসা, খুচরা ব্যবসা, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং কন্ট্রাক্টরীর মাধ্যমে তারা তাদের প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয় করেন। তবে এভাবে অর্থ সংগ্রহের পর অনেকেই মাঝারি আকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠান, পরিবহণ ব্যবসা, আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা এবং গৃহ ও জমির ক্রয়-বিক্রয় উদ্যোগে টাকা খাটাতে থাকেন। এই পর্যায়ে ১৯৬০-এর দশকে তাঁদের সকলেই নানাভাবে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে শুরু করেন। এই রাষ্ট্রীয় সহায়তাকে আশ্রয় করেই এঁরা বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ এবং কেউ কেউ এমনকি ব্যাংক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এঁদের কেউ কেউ মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কেউবা মন্ত্রী হন। এইভাবে এরা পাকিস্তানী বৃহৎ বুর্জোয়াদের কনিষ্ঠ অংশীদারে পরিণত হন।

এই প্রবন্ধেরই তৃতীয় অধ্যায় এদের নতুন মিত্র বৃহৎ নব্য ধনী তথা আমলা-মুৎসুদ্দী পুঁজির উত্থানের স্বাধীনতা-উত্তর তথ্যাবলীও বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা দুটি ক্ষুদ্র নমুনা বেছে নিয়েছি এই দুই গোষ্ঠীর বিকাশের মধ্যে যে তুলনামূলক পার্থক্য রয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখার জন্য। প্রথম নমুনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৩নং তালিকায় উল্লেখিত ১৬ জন বৃহৎ ট্র্যাডিশনাল বাঙালী বুর্জোয়া, যাঁরা স্বাধীনতার আগেই বিকাশ লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় নমুনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন মাত্র ৭ জন স্বাধীনতা-উত্তর নব্যধনী। তবে পূর্বোক্ত ১৬ জনের মধ্যে একজনকে তার বিকাশের চরিত্রের কারণে নব্য ধনীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—যদিও স্বাধীনতার আগেই বেশ কিছু সম্পদ তার হস্তগত হয়েছিল। পাকিস্তান আমলের ট্র্যাডিশনাল বুর্জোয়াদের সম্পর্কে তথ্যাবলী রুশ গবেষক বারানভ এবং ডঃ ফারুকের স্টাডিতে পাওয়া যায়। বৃহৎ নব্য ধনী সংক্রান্ত তথ্যাবলী নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করে ৪নং তালিকায় বিন্যস্ত করা হলো। আমাদের নমুনা খুবই ক্ষুদ্র এবং তাতে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবু 'নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল।'

তালিকা—৪

নব্য-ধনীক শ্রেণীর বিকাশের গতিপথ (নমুনাচিত্র)

ক্রমিক নং	নাম	প্রাথমিক যাত্রাবিন্দু	বর্তমান সম্পদের বিবরণ	ধনী হওয়ার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক যোগাযোগ	বকেয়া ঋণ
১.	আবুল খায়ের (লিট্)	১. পৈত্রিক সূত্রে হারিকেনের চিমনি নির্মাণ কারখানা। ২. ১৯৭৩ সালে ধারে দুটো বাস ক্রয়।	১. সিৎসুবিশীর একমাত্র এজেন্ট (টিউব-ওয়েল) ২. কোরীয়ান হুন্ডেই গাড়ির একমাত্র এজেন্ট ৩. বেঙ্গল জুট ইন্ডাষ্টিজ ৪. বেঙ্গল কার্পেট ইন্ডাষ্টিজ ৫. লিটন জুট মিল ৬. মর্ডান মটরস্ এবং ৭. এ. বি. ব্যাংকের ডিরেক্টর।	১. মুজিব আমলে জনৈক মন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ। ২. মুজিব হত্যার সঙ্গে জড়িত মেজর ডালিমের ভগ্নীপতি এবং '৭৫ পরবর্তী সময়ে নানা সুবিধার্জন। ৩. জেনারেল জিয়ার সঙ্গে সরাসরি ফোনে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষমতা ছিল।	২৩ কোটি ৮৪ লাখ টাকা।
২.	আবিদুর রহমান	১. দা পিপল, কাগজ।	১. দ্য পিপল, ২. নিপ্পন মটরস্	১. আওয়ামী লীগ আমলে এক দফা পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত	প্রায় ৯ কোটি টাকা।

		২. নিপ্পন মটরস্। ৩. গোল্ড হুইল টোবাকো কোঃ ৪. গোল্ডহুইল ফাইবারস্ ৫. পারিজাত এন্টারপ্রাইস ৬. প্রাচী ইঞ্জিনিয়ার্স।	হয়—তখন জনৈক মন্ত্রীর প্রভাবে মুক্তি লাভ করেন। ২. ১৯৭৫ সালে মুজিব হত্যার আগে ব্যাংকের সঙ্গে তার সকল লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৬-এ ক্ষতিপূরণ সহ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৩. জেঃ জিয়া ক্ষমতায় আসার পর তাকে প্রচ্ছদ চিত্র করে লন্ডন থেকে World Times নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কৃপাদৃষ্টি অর্জন করেন।	
৩. এম. এ. সাত্তার	অজানা	১. সাত্তার জুট মিলস্ ২. হাসনা শিপ বিল্ডিং এন্ড নেভিগেশান	১. ১৯৭৭ সালে জিয়া সরকারের আমলে আড়াই কোটি টাকা ঋণ লাভ করেন।	জানা যায় নাই।

ক্রমিক নং	নাম	প্রাথমিক যাত্রাবিন্দু	বর্তমান সম্পদের বিবরণ	ধনী হওয়ার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক যোগাযোগ	বকেয়া ঋণ
			৩. মেসার্স টোবাকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৪. রংপুর ইন্ডাস্ট্রিজ ৫. সাত্তার ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী ৬. হাসনা টোবাকো প্রাঃ লিঃ। ৭. ফতুল্লা সোপ ফ্যাক্টরী	২. জেঃ এরশাদ সরকারের আমলে পাট উপদেষ্টা নিয়োজিত হন। ৩. ৮২-র সামরিক আইনের ছত্রছায়ায় সৃষ্ট জনদলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।	
৪.	মাহমুদুর রহমান	১. উত্তরাধিকারী সূত্রে হাইস্পীড নেভিগেশন কোম্পানীর মালিকানা লাভ।	১. হাইস্পীড নেভিগেশান ২. হাইস্পীড ক্যারিয়ার ৩. ইস্টার্ণ রিভার্স ৪. এক্সপ্রেস শিপিং ৫. এক্সপ্রেস নেভিগেশান সার্ভিস ৬. হাইস্পীড শিপ বিল্ডিং	১. I.W.T.A-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং জিয়ার মন্ত্রীসভার সদস্য ক্যাপ্টেন নূরুল হক হাইস্পীডের বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন। ২. নির্বাচনে জয়ের পর রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে নিজ গ্রামে নিয়ে যান।	প্রায় ১৫ কোটি টাকা।

		৭. বার্ডস্ বাংলাদেশ ৮. হাইস্পীড পেট্রো-লিয়াম ৯. ম্যাকনেইল এন্ড কিলবার্ন।	যান এবং সম্বর্ধনা দেন। ৩. জেঃ এরশাদের আমলে ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন।	
৫. খান মোহাম্মদ ইকবাল	অজানা	১. পদ্মা প্রিন্টার্স ২. সোনালী বোর্ড এন্ড পেপার মিলস্ ৩. কমনওয়েলথ টোবাকো কোঃ লিঃ ৪. ফুজী কালার লিঃ ৫. কালার মেটাল লিঃ ৬. ইউনিমুপেকস্ লিঃ ৭. ন্যাশনাল ব্যাংকের ডিরেক্টর।	১. লেবার পার্টির নেতা মওলানা মতীনের মাধ্যমে এই গ্রুপের সঙ্গে বর্তমানে জেঃ এরশাদের সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।	৩৫ কোটি টাকা।
৬. মাইদুল ইসলাম (মুকুল)	১. পৈতৃক সূত্রে ধনী।	১. কাশেম ড্রাই সেল ২. কাশেম টিম্বারস্	১. মুজিব সরকারের আমলে মাইদুল ইসলাম ৩ কোটি টাকার ইন্ডেন্টিং ব্যবসা লাভ করেন।	১৩ কোটি টাকা

ক্রমিক নং	নাম	প্রাথমিক যাত্রাবিন্দু	বর্তমান সম্পদের বিবরণ	ধনী হওয়ার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক যোগাযোগ	বকেয়া ঋণ
		[পিতা আবুল কাশেম ১৯৭১ সালে মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন]	৩. কাশেম সিউহান গার্মেন্ট (দঃ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ কারবার) ৪. কাশেম পাবলিকেশনস্ (দৈনিক দেশ) ৫. কাশেম সিল্ক মিলস্ ৬. মুকুল ব্রাদার্স (ইন্ডেন্টিং) ৭. এট্সেট্রা এন্টারপ্রাইস (ইন্ডেন্টিং)।	২. জেঃ জিয়ার আমলে তিনি মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। ৩. জেনারেল এরশাদের আমলে প্রথমাবস্থায় গ্রেফতার হন ও কারাদন্ডে দন্ডিত হন্। কিন্তু শীঘ্রই তাকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তিনি এরশাদ সরকারেরই মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হন।	
৭.	জহুরুল ইসলাম	১. লোয়ার ডিভিশান কেরানীর চাকুরী।	১. মিলনার্স লিমিটেড ২. ইষ্টার্ণ হাউজিং লিঃ ৩. ইসলাম ব্রাদার্স প্রপার্টিজ লিঃ ৪. ঢাকা ফাইবার্স লিঃ	১. ১৯৭৪ সালে মুজিব আমলে নানা দেন দরবারের পর গভীর নলকূপ সরবরাহের চুক্তি লাভ করেন। ২. জিয়া সরকারের মন্ত্রীসভার দুজন সদস্য-হাবিবুল্লাহ খান এবং	১২৬ কোটি টাকা।

৫. ক্রিসেন্ট ইন্টার-ন্যাশনাল লিঃ
৬. আফতাব অটো-মোবাইলস্
৭. নাভানা স্পোর্টস্ লিঃ
৮. রি-রোলিং মিলস
৯. আল্ হামরা গ্লাস ইন্ডাষ্ট্রি
১০. নাভানা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১১. মিল্নার্স পাম্প লিঃ
১২. আই. এফ. আই. সি. এবং উত্তরা ব্যাংকের অন্যতম উদ্যোক্তা।
১৩. দেশে-বিদেশে বহু স্থাবর সম্পত্তি।

জাকারিয়া চৌধুরী তার প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবী ছিলেন।

৩. প্রাক্তন পূর্ত সচিব মঈনুল ইসলাম জহুরুল ইসলামের ব্যবসায়িক উপদেষ্টা ছিলেনয়

৪. ১৯৮১ সালে বেআইনীভাবে বাড়তি ১০ কোটি টাকা তদানীন্তন সরকারের কাছে থেকে আদায় করেন এবং এর একটি মোটা অংশ '৮১ সালে প্রেসিডেন্ট সাত্তারের নির্বাচনী তহবিলে দান করেন।

৫. সকল নিয়ম ভঙ্গ করে বাংলা-দেশ ব্যাংক জহুরুল ইসলামকে সরাসরি ঋণ প্রদান করেছে।

তথ্যের উৎস ঃ ১৯৮৪ সালের ১৩ই এপ্রিল, ১১ ও ১৮ই মে, ৮ ও ২২শে জুন, এবং ২৪শে আগষ্টে প্রকাশিত সাপ্তাহিক একতার, "ধনীক গোষ্ঠীর লুটপাটের কাহিনী" শীর্ষক তদন্ত রিপোর্টসমূহ দ্রষ্টব্য।

৪.৩ ৪নং তালিকায় স্বাধীনতা-উত্তর বৃহৎ নব্যধনীদের বিকাশের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে চিত্রটি তথ্যের অপ্রতুলতার দরুণ অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেছে। তবু এদের বিকাশের সঙ্গে ট্র্যাডিশনাল বুর্জোয়াদের বিকাশের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে ঃ

ক. নব্য ধনীদের অধিকাংশই পৈতৃক সূত্রে স্বচ্ছল এবং শিক্ষিত। এদের অনেকেরই পিতা ছিলেন শিক্ষিত পেশাজীবী এবং শহরবাসী।

খ. এরা অত্যন্ত দ্রুত ধনীতে পরিণত হয়েছে। অনেকটা এক লাফে 'ক' থেকে 'চন্দ্রবিন্দুতে' পৌঁছে যাবার মত।

গ. এই ধনী হওয়ার প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আনুকূল্যেই মুখ্য এবং নিরঙ্কুশ ভূমিকা পালন করেছে।

ঘ. এরা রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করেছে। রাষ্ট্রের টাকায় রাষ্ট্রের সম্পদ দখল করেছে। তবে স্বাধীনতার পর এরশাদ সরকারের আমলে যখন পাটকল, বস্ত্রকল ও চিনিকলগুলি তাদের প্রাক্তন ট্র্যাডিশনাল বাঙালী বুর্জোয়াদের হাতে হস্তান্তরিত করা হয় তখন দেখা গেছে যে এরা বা এদের বৈধ উত্তরাধিকারীরাও একইভাবে নব্যধনীদের মতই সমান হারে রাষ্ট্রীয় অর্থ লুট ও অপচয় করেছে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন সরকারী দলিল-পত্রের স্বীকারোক্তিমূলক বিশ্লেষণে ও প্রদত্ত তথ্যাবলীর মধ্যে।

নীচে উদ্ধৃত ৫নং তালিকায় স্বাধীনতা-উত্তর ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী হিসাবপত্র তুলে ধরা হলো। এই তালিকা থেকেও দেখা যায় ঃ—

ক. ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ব্যক্তিগত খাতের বিনিয়োগের অনুপাত ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

খ. বিশেষতঃ ১৯৮৪-৮৫ সালে টাকার অঙ্কের বিচারেও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ১৯৮০ সালেরও নীচে নেমে গেছে।

গ. মুদ্রাস্ফীতিকে হিসাবে নিলে প্রকৃত ব্যক্তিগত বিনিয়োগের প্রবণতা ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ক্রমহ্রাসমান হবে।

ঘ. ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৪-৮৫ এই চার বছরে কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২৭ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গৃহনির্মাণ (১৫০ শতাংশ)। তৃতীয় স্থানে রয়েছে পরিবহণ এবং ব্যবসা/সার্ভিস (উভয় খাতেই ৭৭ শতাংশ)। পক্ষান্তরে সর্বনিম্ন বৃদ্ধির হার হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে—মাত্র ১৩ শতাংশ।

তালিকা—৫
ব্যক্তিগত বিনিয়োগের সামগ্রিক চিত্র
(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক খাত	১৯৭৭-৭৮ পরিমাণ (শতাংশ)	১৯৭৮-৭৯ পরিমাণ (শতাংশ)	১৯৭৯-৮০ পরিমাণ (শতাংশ)	১৯৮০-৮১ পরিমাণ (শতাংশ)	১৯৮১-৮২ পরিমাণ (শতাংশ)	১৯৮২-৮৩ পরিমাণ (শতাংশ)	১৯৮৩-৮৪ পরিমাণ (শতাংশ)	১৯৮৪-৮৫ পরিমাণ (শতাংশ)
কৃষি	—	—	২০০ (২৫.০৩)	২৫৭ (২৫.৮)	৩১৪ (৩০)	৪৩৫ (৩৭.২৮)	৬৮১.৬০ (৪০.৪৮)	১০৫৪.২ (৫০)
ম্যানুফ্যাকচারিং	৯৭.৫০	৯৮.২০	১৭০ (২১.২৮)	২১০ (২১)	২২৬ (২১.৫৮)	২২৩ (১৯.১১)	২৫৪.০৫ (১৫.০৯)	১৯২.৮ (৯)
ট্রান্সপোর্ট	—	—	১১৫ (১৪.০৯)	১৬৮ (১৬.৯)	১৯৩ (১৮.৪৩)	১৪৪ (১২.৩৪)	১৭০.২৫ (১০.১৪)	২০৪.৩ (১০)
ফিজিক্যাল প্লানিং এন্ড হাউজিং	—	—	১৬৪ (২০.৫৩)	১৮৮ (১৮.৯)	১২৪ (১১.৮৪)	১৫৫ (১৩.২৮)	৩৪৬ (২০.৫৮)	৪১০.৩ (১৯)
ট্রেড এ্যান্ড আদার সার্ভিসেস	—	—	১৫০ (১৮.৭০)	১৭৩ (১৭.৪)	১৯০ (১৮.১৫)	২১০ (১৭.৯৯)	২৩১.৫০ (১৩.৭২)	২৬৬.২ (১২)
সর্বমোট			৭৯৯ (১০০)	৯৯৬ (১০০)	১০৪৭ (১০০)	১১৬৭ (১০০)	১৬৮৪ (১০০)	২১২৭.৮ (১০০)

৫. বাংলাদেশে জাতীয় বুর্জোয়া বিকাশের সম্ভাবনা

৫.১ আমরা বাংলাদেশের বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে মূর্ত বিশ্লেষণের সুবিধার্থে কয়েকটি পৃথক বর্গে (Section) বিভক্ত করতে পারি। যেমন—

ক. আমলা বুর্জোয়া: এরা রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্চপদে থাকাকালে স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধভাবে নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের নামে প্রচুর অর্থ বা অন্যান্য ধরনের সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং পরবর্তী সময়ে চাকুরীতে অবস্থান রক্ষা করেই গোপনে বা প্রকাশ্যে বিভিন্ন ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, স্থাবর সম্পত্তি (জমি-জমা, গৃহনির্মাণ) ইত্যাদি খাতে জমানো অর্থ কিছুটা হলেও বিনিয়োগ করেছে।

খ. ট্র্যাডিশনাল বৃহৎ বাঙালী বুর্জোয়া: এই 'গ্রুপটি' পাকিস্তান আমলেই ষাটের দশকে প্রধানতঃ পাটকল ও বস্ত্রকলের মালিক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ তখনই সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় তারা কেউ কেউ অর্থ সঞ্চয় করেছেন তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপব্যবহার করেই। বাকি যারা সরকারের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন না তাদের কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য, কন্ট্রাক্টরী ইত্যাদি পন্থায় ধীরে ধীরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। ডঃ আবদুল্লাহ্ ফারুক এ ধরনের ১৫ জন বৃহৎ বাঙালী উদ্যোক্তার পুঁজি সঞ্চয়ের ইতিহাস ও জীবনী বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ৭৩ শতাংশই (১১ জন) মূল পুঁজি সঞ্চয় করেছিলেন কোন-না-কোন ভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার কারণেই '৭১ সালের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের অধিকাংশের ভূমিকা ছিল হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করা বা নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ নিরাপদ জীবনযাপন করা। তবে অল্প কয়েকজন গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছিলেন।

গ. বৃহৎ নব্যধনী: এরা মূলতঃ স্বাধীনতা-উত্তরকালে নানা অবৈধ পন্থায় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যন্ত দ্রুত, খুব ছোট থেকে লাফ দিয়ে বড় ধনীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এদের বিকাশ মুজিব আমল, জিয়ার আমল, এরশাদের আমল ইত্যাদি সব সময়েই অব্যাহত রয়েছে।

বুর্জোয়া গোষ্ঠীর এই তিনটি বর্গের মধ্যে কোন লৌহদৃঢ় সীমারেখা নেই। খুব সহজেই এরা পরস্পর মিত্র ও অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যেতে পারেন। কারণ বর্তমান মুহূর্তে এদের সকলের জীয়নকাঠি প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে। এই সামগ্রিক বিচারে এদের পুঁজিকে 'আমলা মুৎসুদ্দী' পুঁজি নামে অভিহিত করা চলে। এদের সকলের আরেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এদের 'পরগাছা লুটেরা' চরিত্র। সুতরাং

ক্ষমতাসীন এই বিদ্যমান চক্রটির উপর ভিত্তি করে এদেশে জাতীয় পুঁজি-বাদী বিকাশ সম্ভব নয়।

৫.২ তবে অনেক সময় ধারণা করা হয় যে, যথেষ্ট সময় দিলে এই চক্রটি আদিম অর্থ সঞ্চয়ের পর্ব অতিক্রম করে পুনরায় উৎপাদনশীল বিনি-য়োগের দিকে ঝুঁকতে পারে। বিমূর্ত বিচারে এ ধরনের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। যদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বর্তমানে অনুসৃত সংকীর্ণ পুঁজিবাদী ধারায় কিছুটা বিস্তৃতি, কিছুটা শৃংখলা, কিছুটা উৎপাদন-শীলতা, কিছুটা আধুনিকতা আনতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সংস্কার সাধনে সক্ষম হন তাহলে বর্তমান ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া গোষ্ঠীটিও উৎপাদনশীল খাতে ধীরে ধীরে কিছু অর্থ বিনিয়োগ করতে বাধ্য হতে পারে। কিন্তু তাহলে দেশে শিল্প-খাতে মুনাফার হার আকর্ষণীয় করতে হবে, রপ্তানীযোগ্য শিল্পের বাজার খোলা ও ক্রমপ্রসারমান রাখতে হবে, স্থানীয় বাজারকে প্রসারিত করার জন্য কোন-না-কোন ধরনের কৃষি সংস্কার নীতি কার্যকরী করতে হবে এবং ঋণ দান, ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বুর্জোয়া নৈতিকতা চালু করতে হবে। যে-হেতু এসব নূন্যুতম সংস্কার ক্ষমতাসীন স্থানীয় 'আমলা মুৎসুদ্দী' গোষ্ঠীর বর্তমান নিরস্কুশ বিকাশকে কিছুটা সংযত করবে সেহেতু তাদের মধ্যে এসব সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী 'লবি' থাকবে এবং এসব পদ-ক্ষেপ প্রসঙ্গে তাদের ভিতরে পক্ষে-বিপক্ষে নানা উপদল সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং মূর্ত বিচারে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে কোন এক পর্যায়ে 'আমলা মুৎসুদ্দী'দের বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে সীমিত উৎপাদনমুখীনতায় ফিরিয়ে আনা একেবারে অসম্ভব না হলেও খুব কঠিন এবং দুরূহ। তদুপরি যদি তা সম্ভবও হয় সেটা আমাদের দেশের পুঁজিবাদী বিকাশের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে হবে না—হবে সাম্রাজ্যবাদের চাপে ও নির্দেশক্রমে। সুতরাং একে কোনক্রমেই জাতীয় বুর্জোয়ার বিকাশ নামে অভিহিত করা চলে না।

৫.৩ এছাড়াও বুর্জোয়াদের মধ্যে আমাদের দেশে অন্য যে দুটি গোষ্ঠী রয়েছে তারা হচ্ছে ঃ

ক. মাঝারী ধনী এবং খ. ছোট ধনী।

এই ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের সম্পর্কে তথ্য একান্তই অপ্রতুল। তথাপি 'রুরাল ইন্ডাষ্ট্রি সার্ভে প্রজেক্ট'-এর তথ্য থেকে এ ধরনের ১২০৭টি মালিকদের কারখানা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এসব কারখানার ৯৯ শতাংশই হচ্ছে ব্যক্তি বা পারিবারিক মালিকানাধীন। মাত্র ১ শতাংশ জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী সমবায় বা অংশীদারী ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

এসব ইউনিটের মালিকদের ৬৫ শতাংশই স্থাপন করেছেন ১৯৬৯ সালের আগে। ৩৫ শতাংশের প্রতিষ্ঠাকাল স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ নাগাদ।

এসব শিল্পের সংখ্যাগত গড় বাৎসরিক "exponential rate of growth" ছিল ১৯৪৭-৬৯ কালপর্বে ৫.১ শতাংশ। কিন্তু ১৯৭০-৭৯ কালপর্বে তা কমে হয়েছে ৪.৫ শতাংশ। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর এদের সংখ্যাবৃদ্ধি শ্লথ হারে হচ্ছে।

এসব ক্ষুদে মালিকদের ৪৫ শতাংশের পিতা ছিলেন কৃষক/জেলে। ১৫ শতাংশের পিতা পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৪ শতাংশের পিতা ছিলেন চাকুরীজীবী। ২৫ শতাংশের পিতা শিল্পের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন।

এসব ক্ষুদে মালিকদের ৪৫ শতাংশের মূল পেশা ক্ষুদ্র শিল্প। কিন্তু বাকীরা ক্ষুদ্র শিল্পকে দ্বিতীয় পেশা (subsidiary occupation) হিসাবে নিয়েছেন। বাদবাকী এই ধরনের ৪৬ শতাংশের মধ্যে ২৬ শতাংশের প্রধান পেশা কৃষি, ১০ শতাংশের প্রধান পেশা ব্যবসা। আরো ১০ শতাংশের ক্ষুদ্র শিল্প দিয়ে চলছে না, তাই তারা অন্যত্র পেশা নির্বাচনের চেষ্টা চালাচ্ছে অর্থাৎ সহজ ভাষায় অন্যত্র কাজ খুঁজছে।

মাঝারী ধনী ও ছোট ধনীরা মাঝারী এবং ছোট বটে কিন্তু তাদের মধ্যেও বড় ধনী হবার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য এদেশে এদের বৃহদাংশ বিকশিত হতে পারছে না ঃ

ক. রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা 'আমলা মুৎসুদ্দী' চক্রকে ডিঙ্গিয়ে তাদের সকলের কাছে সুযোগ সুবিধা পৌঁছাচ্ছে না।

খ. 'আমলা মুৎসুদ্দী' চক্রের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় তারা অনেকেই হেরে যাচ্ছে।

গ. সাম্রাজ্যবাদের 'খোলা বাজার' নীতি অনুযায়ী কাঁচামাল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণের দাম বৃদ্ধি তাদের সকলকেই আঘাত করছে।

ঘ. আভ্যন্তরীণ বাজারে সাম্রাজ্যবাদী সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা হেরে যাচ্ছে।

ঙ. স্থানীয় বাজারে ক্রয় ক্ষমতার অভাবে তাদের ছোট-মাঝারী শিল্পের উৎপাদন প্রায়ই অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে।

৫.৪ উল্লিখিত প্রতিকূলতাগুলি মাঝারী বুর্জোয়াদের তুলনায় ছোট মালিকদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কতিপয় ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তা নিজেদের মিতব্যয়িতা, তীব্র শ্রম শোষণ (মহিলা ও শিশুশ্রম), কঠোর ব্যক্তিগত শ্রম, কৃচ্ছ্রতা ইত্যাদির

মাধ্যমে আজও টিকে রয়েছে। ক্ষুদে শিল্পের এই ব্যতিক্রমগুলি প্রধানতঃ অসংগঠিত খাতে (জিঞ্জিরা ও গ্রামীণ শিল্প খাতে) ধুঁকে ধুঁকে টিকে রয়েছে। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও স্রেফ সংখ্যার বিচারে এবং শ্রম নিয়োজনের মাপকাঠিতে তাদের গুরুত্ব সামগ্রিক অর্থনীতিতে কম নয়। ১৯৮৪ সালে এ ধরনের ছোট শিল্পের গড় শ্রম নিয়োজনের মাত্রা ছিল ইউনিট প্রতি ১৬'৫২ জন। এবং মোট ইউনিটের সংখ্যা ছিল ২৫৯০৭টি। সেই অনুযায়ী এদের অধীনে মোট শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়াবে ৪ লক্ষ ২৮ হাজার। ১৯৮৪ সালে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মোট সংযোজিত মূল্যে (value-added) এদের আপেক্ষিক অবদান ছিল ১৯'৫ শতাংশ যা ৩৪৩ কোটি টাকার সমান। অর্থাৎ জি. ডি. পি.'র ১.৭ শতাংশ। এই শিল্পোদ্যোক্তরা বর্তমানে স্থানীয় 'আমলা মুৎসুদ্দী' পুঁজি, স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে আছেন। এই অর্থে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া ও ব্যতিক্রমী কিছু উদীয়মান মাঝারী জাতীয় বুর্জোয়ার অস্তিত্ব আমাদের দেশে রয়েছে। তবে ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি এদের নানা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এদের সীমাবদ্ধতাগুলি নিম্নরূপ ঃ

এদের মধ্যে যখনই কেউ রাষ্ট্রীয় কৃপা লাভ করে উপরে উঠবেন এবং প্রচলিত ধারায় ধনী হবার সুযোগ পাবেন তখনই তার দ্রুত পক্ষ পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মালিকদের বাদ দিলেও মাঝারী শিল্পোদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে পক্ষ পরিবর্তনের এই সম্ভাবনা বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদি উল্লিখিত 'সংস্কারবাদী' নরম লাইনে অগ্রসর হয় তাহলে শুধু মাঝারী নয়, ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা সমর্থন ও আশ্রয় লাভ করতে পারে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ যদি বর্তমান সংকীর্ণ 'আমলা মুৎসুদ্দী' চক্রের বাইরে পুঁজিবাদের ভিত্তিকে আরেকটু গণতান্ত্রিক ও সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়—তাহলে এদের মধ্যে উত্তরোত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রবণতা কমে যাবে। এবং এদেশে জাতীয় বুর্জোয়ার বিকাশের সম্ভাবনা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পপতিদের ক্ষেত্রেও ক্রমশঃই দ্রবীভূত হয়ে পড়বে।

৫.৫ তবু বহিঃস্থ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিভিন্ন অংশের মতভেদের (বৃটিশ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ও ভারতীয় উপ-সাম্রাজ্যবাদ বনাম আমেরিকা ও অন্যান্য) ফাটল দিয়ে তথাকথিত জাতীয় বুর্জোয়ার অংকুরোদগম যদি কখনও হয়ও তা বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যাবলীর কোন সমাধান দিতে পারবে না। বাংলাদেশের বিদ্যমান সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা

দেখে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যেকোন ধাঁচের ধনতন্ত্র অভিমুখীন ধারাতে এদেশের সমস্যার জোড়াতালি মীমাংসাটুকুও আজ অসম্ভব।

৬. উপসংহার

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তদানীন্তন পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট হয়ে সমগ্র পাকিস্তানে এক অবাধ ধনবাদী বিকাশের ধারা চালু করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ক্রমশঃ এক ঔপনিবেশিক ধরনের শোষণের অধীনে নিয়ে আসেন। ষাটের দশকের শুরু থেকে মুখ্যত রাজনৈতিক প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে একটি বাঙ্গালী বুর্জোয়া গোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলে দ্রুতগতিতে পূর্ব পাকিস্তানে কয়েকটি বাঙালী ধনিক পরিবার গড়ে ওঠে। ৬ দফা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত পুরো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেই এদের ভূমিকা ছিল দোদুল্যমান। '৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের সময় এরা অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং অনেকেই নিজেদের কল-কারখানাও খোলা রেখেছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক জাতীয়করণের ফলে উল্লিখিত বৃহৎ বাঙালী বুর্জোয়াদের বিকাশ খর্ব হয়। কিন্তু এসব প্রগতিশীল পদক্ষেপ সত্ত্বেও কৃষি, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের ভিতরে নানাভাবে পুঁজিবাদী বিকাশ অব্যাহত থাকে। ঐই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী দলের মধ্যে অবস্থানরত অবাধ পুঁজিবাদী বিকাশের সমর্থকদের আনুকূল্যে মূলতঃ নানা অবৈধ পন্থায় দ্রুত বিকাশ লাভ করে একদল নব্য ধনিক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরা ক্রমে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার এজেন্টরা এক নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

অবশেষে ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশে পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের সমর্থকরাই ক্ষমতাসীন হয়। পরবর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ধারা আরও তীব্র ও ত্বরান্বিত হয়েছে। '৭৫ পরবর্তী অনুসৃত ধারায় বিভিন্ন উদ্যোগে এবং সাম্রাজ্যবাদের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে সংকুচিত করে ব্যক্তিগত খাতের আওতা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং খোলা বাজার নীতি গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত

করার প্রচেষ্টা আজও চলছে।

বাংলাদেশে পুঁজিবাদী বিকাশের উপরোক্ত বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাংলাদেশের নাজুক অবস্থানের দরুন বাংলাদেশের পুঁজিবাদী বিকাশের কতক বিশিষ্টতা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

ক. যে পুঁজিপতিরা এখানে দ্রুত বিকাশ লাভ করছে তাদের পুঁজি গঠনে রাষ্ট্র পালন করছে প্রত্যক্ষ ও মুখ্য ভূমিকা।

খ. মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের মাধ্যমে ও অন্যান্যভাবেও সাম্রাজ্যবাদ এই প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গ. এখানকার ধনতান্ত্রিক বিকাশ চিরায়ত পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক বিকাশের অনুরূপ নয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় তাই নানা প্রাক্‌পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামো আজও বিকৃত, মিশ্রিত বা অবশেষরূপে টিকে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল থেকে এখানে যে ধরনের পুঁজিবাদী বিকাশ দ্রুততর হচ্ছে তা সমাজের সামগ্রিক পুঁজিবাদী রূপান্তরে সক্ষম হবে না।

পুঁজিবাদী বিকাশের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ধনিক সৃষ্টির বিপদ উপস্থিত হয়েছে। পাশাপাশি অব্যাহত স্বৈরশাসনের কারণে এখানে সামরিক-বেসামরিক আমলা পুঁজিও গড়ে উঠেছে। বিকাশের অনিবার্য প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠী ও এই সামরিক-বেসামরিক আমলা পুঁজি ক্রমশঃ পরস্পরের কাছাকাছি আসছে এবং প্রায়শই সম্পূরক হয়ে যাচ্ছে।

সাধারণভাবে নির্ভরশীল পুঁজিবাদী বিকাশের সমর্থক রাষ্ট্র থেকে অনিবার্যভাবে এবং ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র পরিণত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী মদদপুষ্ট মুষ্টিমেয় বড় ধনিক ও আমলা বুর্জোয়ার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রক্ষমতার শ্রেণীগত ভিত্তি তাই আজ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে এর মূলে অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে 'আমলা মুৎসুদ্দী' পুঁজি।

বস্তুতঃ এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি এক ও ও অভিন্ন প্রক্রিয়া। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী মদদ, রাষ্ট্রীয় সহায়তা, জনগণকে শোষণ, মজুতদারী, কালোবাজারী, ফাটকাবাজী, ইন্ডেন্টিং, অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য, কন্ট্রাক্টরী প্রভৃতি নানা উপায়ে যে সম্পদ এই শোষক শ্রেণী আহরণ করেছে তা উৎপাদনশীল খাতে পুনর্বিনিয়োগ হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত এ সম্পদ বিনিয়োজিত হচ্ছে মূলতঃ অনুৎপাদনশীল খাতে বা কিছু কিছু সেবামূলক খাতে। এদের মধ্যে অনেকেই দেশের সম্পদ

বাইরে পাচার করছে এবং বাড়তি ভোগ-বিলাসের মাধ্যমেও সম্পদের অংশবিশেষ অপব্যয় করছে। বস্তুতঃ 'পরগাছা ও লুটেরা' চরিত্র হচ্ছে 'আমলা-মুৎসুদ্দী' পুঁজির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের বিদ্যমান এই বিশেষ পুঁজিবাদী ধারা জনজীবনের সংকটকে আরও তীব্রতর করছে, নয়া উপনিবেশিক শোষণকে জোরদার করছে, প্রাক্‌পুঁজিবাদী উত্তরনশীল উৎপাদন কাঠামোকে জিইয়ে রেখেছে এবং উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী ধনিকদের মনেও কোন কোন ইস্যুতে আজ ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। পরিস্থিতিকে ঠেলে দিচ্ছে বিপর্যয় অথবা বিপ্লবের দিকে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. রমণীমোহন দেবনাথ—ব্যবসা ও শিল্পে বাঙালী, ভাষা শহীদ গ্রন্থমালা, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫

২. এস. এস. বারানভ,—পূর্ববাংলা ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য ঃ (১৯৪৮—১৯৭১), (বঙ্গানুবাদ) জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬

৩. রেহমান সোবহান—"বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ও আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি", বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮২

৪. রেহমান সোবহান—দ্য ক্রাইসিস অফ এক্সটারনাল ডিপেণ্ডেন্স, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৮২

৫. রেহমান সোবহান—পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এ্যাণ্ড দ্য নেচার অফ দ্য স্টেট, দ্য কেস অফ সাউথ এশিয়া, সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিস, ১৯৮৩

৬. রেহমান সোবহান এবং মোজাফ্‌ফর আহমেদ,—পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ইন এ্যান ইন্টারমিডিয়েট রেজিম ঃ এ স্টাডি ইন দ্য পলিটিক্যাল-ইকনমি অব বাংলাদেশ, বি. আই. ডি. এস. ১৯৭৯

৭. বাংলাদেশের কয়েকজন শিল্পোদ্যোগীর জীবনকাহিনী—সম্পাদনা আবদুল্লাহ ফারুক ও রেজাউল করিম, ব্যবসায় গবেষণা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৯৪

৮. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, "ফ্যাক্টস্‌ এণ্ড ডকুমেন্টস্‌, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড", ঢাকা, ১৯৮৬

৯. পরিকল্পনা কমিশন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ ১৯৮৫—৯০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

১০. পরিকল্পনা কমিশন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ ১৯৮০—৮৫, মে, ১৯৮৩

১১. পরিকল্পনা কমিশন, "ইকনমিক রিভিউ" ১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪

১২. রেহমান সোবহান ও আহমেদ আহসান, ডিসইনভেস্টমেন্ট এ্যাণ্ড ডিনেশনালাইজেশন—প্রোফাইল এ্যাণ্ড পারফরমেন্স, অক্টোবর ১৯৮৪

১৩. রেহমান সোবহান, বাংলাদেশের শিল্পনীতি এবং জাতীয় স্বয়ম্ভরতা : কিছু ভাবনা, সংবাদ, অর্থনীতির পাতা, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪
১৪. বিশ্ব ব্যাংক দলিল, ১৯৮০, ভল্যুম দুই, পার্ট—১, সাবসেক্টোর স্টাডি (গোপনীয়)
১৫. বিশ্ব ব্যাংক কান্ট্রি রিপোর্ট, ১৯৮৪, ফেব্রুয়ারী
১৬. রেহমান সোবহান, এম. এম. আকাশ ও আহমেদ আহসান (প্রকাশিতব্য), টার্মস এ্যাণ্ড কন্ডিশনস অব হ্যান্ডিং ওভার জুট এ্যান্ড টেক্সটাইল মিলস্